অমর একুশে বইমেলার সাহিত্যিক মুখপত্র

সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকা

অর্ধ-সাপ্তাহিক

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ৫ । মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ । ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ২০ টাকা

www.sharetindinerpotrika.com

ভ্রমণ সংখ্যা

প্রচ্ছদ : আন্দামান বাগচী

প্রধান রচনা

ভ্রমণ মানে শুধু স্থান পরিবর্তন নয়; এটি দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন। ঘরের বাইরে বের হলেই তা ভ্রমণ—দেশের ভেতরে হোক কিংবা বিদেশে। কখনও কাজের প্রয়োজনে, কখনও নিছক কৌতূহলে মানুষ পথে বের হয়। কিন্তু সেই যাত্রাপথে যদি চারপাশের প্রকৃতি, মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও সমাজকে কৌতূহলী চোখে দেখা হয়, তবে সেই অভিজ্ঞতা সাধারণ সফরকে রূপ দেয় এক গভীর মানবিক অভিযাত্রায়। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে অল্প সময়ের পরিচয়, নতুন শহরের অলিগলি, অজানা সংস্কৃতির স্পর্শ—সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতার শিল্পিত প্রকাশই ভ্রমণসাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণসাহিত্যের ঐতিহ্য দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ। এ ধারার অন্যতম পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণচর্চা ছিল বিশ্বজোড়া। জাপান, রাশিয়া, পারস্য থেকে শুরু করে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকা—নানা দেশে তিনি গিয়েছেন এবং

এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

অনুবাদ । প্রবন্ধ

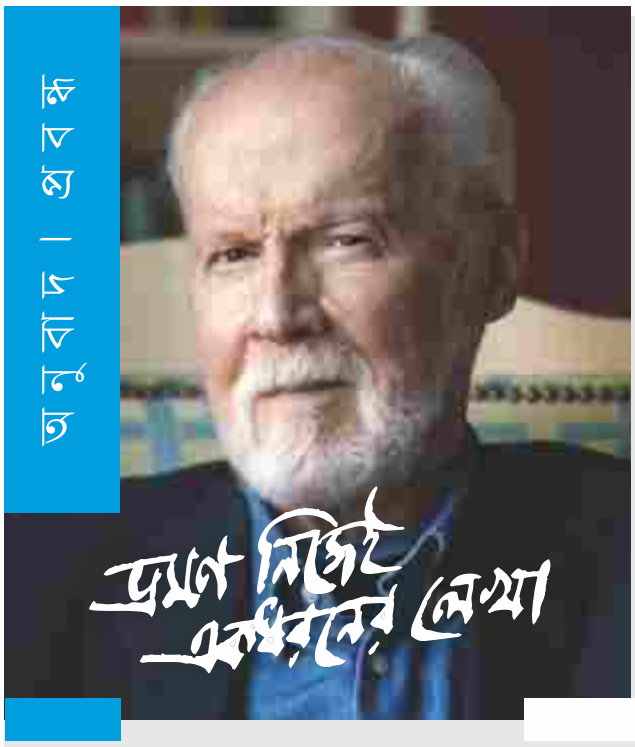

মাইকেল মিউশ

আমি লন্ডন থেকে নিউ অরলিন্সে এসেছি—যেখানে আমি বছরের একটি অংশ কাটাই। আপনাদের অনেকেই নিজেদের বাড়ি ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরপথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন, যাতে আমি ভ্রমণ লেখা নিয়ে বক্তৃতা দিতে পারি এবং আপনারা তা শুনতে পারেন। প্রথমে বিষয়টি হয়তো তুচ্ছ বা হালকা বলে মনে হতে পারে—বিশেষত একটি আধুনিক ভাষা-সমিতির সম্মেলনে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভ্রমণ কোনো তুচ্ছ বিনোদন নয়; সাহিত্যিক অর্থে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম।

প্রথমেই আমাদের ভ্রমণকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। অনেক সমালোচকের মতে প্রকৃত ভ্রমণ আজ আর নেই; তার জায়গা নিয়েছে পর্যটন। আর পর্যটনকে প্রায়ই সাংস্কৃতিকভাবে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আমরা হয়তো পর্যটক হই, কিন্তু স্বীকার করতে চাই না। আমরা সবাই চাই নিজেকে প্রকৃত ভ্রমণকারী হিসেবে ভাবতে।

তবু আমার দাবি—ঐতিহ্যগত অর্থে ভ্রমণ এখনো সম্ভব এবং তা লেখকদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পাঠকদের জন্যও তেমনি। ঈশ্বরের ‘মৃত্যু’ ঘোষণার পরেও যেমন ধর্মবিশ্বাস টিকে আছে কিংবা উপন্যাসের ‘সমাপ্তি’ নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও লেখকেরা যেমন উপন্যাস লিখে চলেছেন, তেমনি মানুষ এখনো পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা এমন এক অভিজ্ঞতার খোঁজে থাকে, যাকে কবি ওয়ালেস স্টিভেন্স বলেছিলেন ‘শুধু চলাফেরা করার আনন্দ’। হয়তো স্থিরতা আমাদের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয় বলেই আমরা চলতে চাই, নতুন মানুষের সংস্পর্শে আসতে চাই, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। আমরা যেন

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

। সাক্ষাৎকার ।

ফারুক মঈনউদ্দীন। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে নিজেকে কথাসাহিত্য, অনুবাদ, সাহিত্য সমালোচনা, ভ্রমণ ও ব্যাংকিং বিষয়ক লেখালেখিতে ব্যাপৃত রেখেছেন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৯ অর্জন করেছেন আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনি শাখায়। *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকা*র পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আমিরুল আবেদিন**

পোর্ট্রেট : রাজীব রাজু

মানসম্মত ভ্রমণলেখক এ দেশে হাতেগোনা

—ফারুক মঈনউদ্দীন

আপনার তো ঘোরাঘুরির অনেক শখ। সেটাকে ঠিক লেখালেখিতে নিয়ে আসার ভাবনাটা এলো কীভাবে? ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর লেখার অভিজ্ঞতাটা মিলিয়েই বলুন।

ফারুক মঈনউদ্দীন : তারুণ্যে কিছুদিন হস্তরেখাবিদ্যা চর্চা করেছিলাম। তখন নিজের হাত দেখে দুঃখ হতো যে, আমার বিদেশ ভ্রমণের যোগ নেই। তারপর যখন প্রথমবারের মতো কলকাতা যাই, তখনও সেটাকে বিদেশযাত্রা মনে হয়নি। কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদেশ ভ্রমণ মানে সমুদ্রপাড়ি দেওয়া। উপরন্তু কলকাতাকে বিদেশ বলে মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

সাড়ে৩দিনের প·ত্রি·কা

১ম পৃষ্ঠার পর

মানসম্মত ভ্রমণ লেখক...

পরবর্তী সময়ে মুম্বাই গেলেও আমার বিদেশযাত্রা হয় না, কারণ মুম্বাই স্থলপথে যাওয়া যায় বলে সমুদ্রপাড়ির সুযোগ নেই। অবশেষে যখন প্রথমবারের মতো আমেরিকা যাই, তখন বুঝতে পারি আমার হস্তরেখাবিদ্যায় ভুল ছিল।

প্রথমবার কলকাতা যাওয়ার পর থেকেই ভ্রমণের আগ্রহ শুরু হলেও ভ্রমণকে সাহিত্যে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছিল মুম্বাই থাকাকালীন প্রথম আলোতে নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া কলাম 'মুম্বাইর চিঠি' দিয়ে। এছাড়াও মুম্বাইবাসের সময় ভারতের অসংখ্য পর্যটনযোগ্য জায়গায় অবারিত ভ্রমণের সুযোগ আমার মধ্যে ভ্রমণের আগ্রহটাকে উসকে দিয়েছিল। এই আগ্রহ সমুন্নত থাকার পেছনের মূল কারণ, দেশটির পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং ভ্রমণবান্ধব পরিবেশ। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকলে এই আগ্রহে ভাটা পড়ত, সন্দেহ নেই।

প্রথম আলোতে 'মুম্বাইর চিঠি' যখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন দেশের একাধিক প্রকাশক লেখাগুলো নিয়ে একটা বই প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে প্রথমবারের মতো সমুদ্রপাড়ি দিয়ে সত্যিকার বিদেশভ্রমণের সুযোগ ঘটে আমেরিকা যাওয়ার পর। আমেরিকা থেকে মুম্বাই ফিরে যাওয়ার পর সেই ভ্রমণের ওপর পর্যায়ক্রমে লেখা শুরু করার প্রণোদনা পাই 'মুম্বাইর চিঠি'র পাঠকদের কাছ থেকে ইমেইলে পাওয়া অসংখ্য প্রতিক্রিয়া থেকে। পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরার পর প্রায় যুগপৎভাবে 'মুম্বাইর চিঠি'র গ্রন্থরূপ *মোহিনী মুম্বাই* এবং আমেরিকা ভ্রমণকাহিনি *নির্ঘুম নিউ ইয়র্ক* প্রকাশিত হলে ভ্রমণকে সাহিত্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়েছিল বলা যায়।

বাংলাদেশে অনেকেই ভ্রমণ নিয়ে লিখছেন। তবে ভ্রমণ নিয়ে তো সম্ভবত লিখলেই হয় না। একজন ভ্রমণ লেখককে একইসঙ্গে ফটোগ্রাফার, এমনকি তথ্য উপস্থাপনেও নিষ্ঠ হতে হয়। এ দিকটা আপনার নিজের লেখাগুলোর আঙ্গিকে যদি বলেন।

ভ্রমণ নিয়ে লেখার কাজটাকে যত সহজ বলে মনে করেন অনেকে, কাজটা তেমন নয়। গল্প উপন্যাসে আপনি কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন বলে অনেক কিছুই লিখে ফেলা সম্ভব হয়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনি আপনাকে লিখতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে

ফারুক মঈনউদ্দীন : ভ্রমণ নিয়ে লেখার কাজটাকে যত সহজ বলে মনে করেন অনেকে, কাজটা তেমন নয়। গল্প উপন্যাসে আপনি কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন বলে অনেক কিছুই লিখে ফেলা সম্ভব হয় কিন্তু ভ্রমণকাহিনি আপনাকে লিখতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে, ফলে এখানে কল্পকাহিনি লেখার সুযোগ নেই। একইসঙ্গে বাস্তব বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনাকে সাহায্য নিতে হবে সাহিত্যের নানান উপকরণের। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, কিছু কল্পনা মিশিয়ে দিতে কোনো দোষ নেই। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর *সত্যি ভ্রমণকাহিনী*তে লিখেছেন, 'ভ্রমণকাহিনী বললেই বুঝতে হবে যে, খানিকটা সত্যের ভেজাল নিশ্চয়ই মেশানো আছে লেখাটার মধ্যে।...রূপকথায় রাজার নফর সফরে যায়, ভ্রমণকাহিনীতে যায় লেখক।...যারা বুদ্ধিমান, তারা ভ্রমণকাহিনীও পড়ে না...তারা কেনে ট্যুরিস্ট গাইড। এদের চাইতেও যারা কড়াপাকের লোক...তারা বলে মিথ্যেটাকে মিথ্যের মতো করে লিখলে তাকে বলে উপন্যাস; আর মিথ্যেটাকে সত্যের মতো করে লিখলে হয় ভ্রমণকাহিনী।' ভ্রমণকাহিনিকে কেবল প্রকৃতি এবং দর্শনীয় স্থানের বর্ণনার মধ্যে সীমিত রাখা যায় না। ফলে আপনাকে পড়াশোনা করে বের করতে হয় জায়গাটার ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজতত্ত্ব। সেইসঙ্গে সেখানকার মানুষ, সংস্কৃতি এবং জীবনাচার সম্পর্কেও আপনার পর্যবেক্ষণ থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তির অনন্যতা, অর্থাৎ অন্যেরা যা লক্ষ করে না, আপনার দৃষ্টি যেতে হবে সেখানে। আমরা যদি বর্তমান সময়ের প্রবল পাঠকপ্রিয় মঈনুস সুলতানের ভ্রমণকাহিনিগুলোর দিকে তাকাই, স্পষ্ট বুঝতে পারি তাঁর বর্ণনার সঙ্গে রয়েছে সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তির ফিকশনধর্মী অনুপান। এরকম কাজ তখনই সম্ভব, যখন লেখক নিজেও একজন শক্তিশালী গল্পকার হিসেবে পরিচিত ও প্রমাণিত হন। ভ্রমণের সঙ্গে ফটোগ্রাফির একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে ভ্রামণিকের ছবি তোলার মোটামুটি পারদর্শিতা থাকা উচিত। কারণ ভ্রমণের সময় তোলা ছবিগুলো পরবর্তী সময়ে ট্রাভেল নোট হিসেবে কাজ করে। এমনকি পরবর্তী সময়ে ছবি থেকে বের হয়ে আসে লেখার বহু বাড়তি উপকরণ, যা ভ্রমণের সময় হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

গোটা বিশ্ব ক্রমেই ভূরাজনৈতিক কারণে সংকটাপন্ন। এ সময় দেশের বাইরে ভ্রমণ অনেক জটিল হয়ে গেছে। আমাদের দেশের ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সমস্যাগুলো কী রকম বলে দেখছেন?

ফারুক মঈনউদ্দীন : আমাদের দেশের ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সবচাইতে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে আমাদের পাসপোর্টের ক্রমহ্রাসমান গ্রহণযোগ্যতা। এটিকে কেবল সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখলে চলবে না, এই সমস্যার জন্য দায়ী আমরাই। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে অবৈধভাবে থেকে যাওয়া এবং অবৈধভাবে সেসব দেশে ঢোকা মানুষের তালিকায় বাংলাদেশের নাগরিকদের সংখ্যা কম নয়। পত্রিকার খবরে আমরা দেখেছি, গত ১০ বছরে বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন প্রায় সাত লাখ বাংলাদেশি, অর্থাৎ বছরে গড়ে ৭০ হাজার মানুষ। বৈধ পথে বিদেশ গেলেও অবৈধ হয়ে ফিরে আসা মানুষের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। যে দেশের নাগরিকেরা বিদেশে গিয়ে অবৈধভাবে থেকে যায়, সেদেশের প্রকৃত ভ্রমণকারীদের ভিসা দিতে কড়াকড়ি কিংবা একেবারেই না দিলে আমরা কাকে দোষারোপ করব?

দ্বিতীয়ত, নানান দেশের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আমাদের জাতভাইদের জীবনযাপন, আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ সেসব দেশের নাগরিকদের কাছে কখনো কখনো উৎপাত বলে মনে হয়।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ
পড়তে স্ক্যান করুন

১ম পৃষ্ঠার পর

ভ্রমণ নিজেই...

জন্মগতভাবেই এমন এক যাত্রার দিকে ধাবিত হই, যেখানে গন্তব্যের পাশাপাশি আবিষ্কারের সম্ভাবনাও থাকে।

মনোবিশ্লেষক ফ্রয়েড ধারণা করেছিলেন, ভ্রমণের আনন্দের একটি বড় অংশ নিহিত আছে শৈশবের সেই আকাঙ্ক্ষায়—পরিবার, বিশেষত পিতার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছায়। এই অর্থে ভ্রমণকে এক ধরনের বিদ্রোহী বা বিধ্বংসী কর্ম হিসেবেও দেখা যায়। ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা নিজের অস্তিত্বগত পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করি। আমি ভ্রমণ করি—অতএব আমি আছি।

পল ফাসেল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই *Abroad*-এ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ভ্রমণ ও ভ্রমণসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মহাযুদ্ধের সময় অধিকাংশ মানুষকে ঘরে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল অথবা সেনাবাহিনী যেখানে পাঠিয়েছে সেখানেই থাকতে হয়েছে। এর ফলে ইংরেজি শিল্প ও সাহিত্যেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ফাসেলের মতে, ভ্রমণ না থাকলে কল্পনার পরিসর সংকুচিত হয় এবং বৌদ্ধিক সম্ভাবনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লেখকদের জন্য ভ্রমণ প্রায় বাতাসের মতোই প্রয়োজনীয়, কারণ এটি স্বাধীনতা, উদ্দীপনা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়।

আমাদের অনেকেই হয়তো সচেতনভাবে উপলব্ধি করি না, তবু ভ্রমণ যা এবং যা প্রতীকায়িত করে—উভয়ের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ রয়েছে। ইতিহাসে বহু স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছে বা কেবল অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং বাইরের বিশ্বের সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ রেখে দেওয়া। মানুষের চলাচলের স্বাধীনতা সংকুচিত করে স্বৈরশাসকেরা এই বিশ্বাস জোরদার করতে চেয়েছে যে মাতৃভূমিই পবিত্র এবং বিদেশের মানুষ সন্দেহজনক বা বিপজ্জনক।

ভ্রমণলেখক রবার্ট বায়রন একসময় মনে করেছিলেন, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অনেক ব্যর্থতার কারণ ছিল কল্পনাহীন ভ্রমণ। একইভাবে প্রশ্ন তোলা যায়—মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার সমস্যাগুলোর পেছনেও কি সেই অঞ্চল ও তার মানুষের সম্পর্কে অজ্ঞতা আংশিকভাবে দায়ী নয়? কখনো রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা জটিল বাস্তবতাকে সরলীকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। ভ্রমণ বাস্তবতার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়।

ফাসেল আরও বলেছেন, 'ভ্রমণ হলো শ্রম।' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'travail' থেকে, যার অর্থ কষ্ট বা পরিশ্রম। পর্যটনশিল্পের বিকাশের আগে ভ্রমণকে এক ধরনের অধ্যয়নের মতো মনে করা হতো, যার ফল ছিল মানসিক বিকাশ ও বিচারবোধের পরিপক্বতা। আজও অনেক তরুণ বিদেশে পড়াশোনা করতে যায় বা ব্যাকপ্যাক নিয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়—নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের আশায়। লেখকদের ক্ষেত্রেও খোলা পথ একাধারে বিদ্যালয় ও মুক্তি—একটি উপায়, যার মাধ্যমে তারা অজানাকে অনুসন্ধান করে।

অবশ্য ভ্রমণের নিম্নমানের রূপও আছে। কখনো মানুষ ভ্রমণে গিয়েও নিজের পূর্বধারণা ছাড়া কিছুই নিয়ে আসে না। আবার এমন ভ্রমণলেখাও আছে, যা কেবল গাইডবুকের মতো—হোটেলের চাদর কত পরিষ্কার বা রেস্তোরাঁর খাবার কেমন ছিল তার বিবরণে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমি যে ভ্রমণলেখার কথা বলছি তা এর চেয়ে অনেক গভীর—এটি সাহিত্যিক অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

কিছু সমালোচকের মতে প্রকৃত ভ্রমণ আজ আর নেই। কিন্তু আমি এ মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। পৃথিবী হয়তো অনেক ক্ষেত্রে একরকম হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখনো এমন অসংখ্য স্থান রয়েছে যেখানে অজানা ও বিপদের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা বা মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চল এখনো জটিল, বৈপরীত্যপূর্ণ এবং লেখকদের জন্য গভীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। আধুনিক প্রযুক্তি পৃথিবীকে সহজলভ্য মনে করালেও বাস্তবে বহু অঞ্চল এখনো অচেনা ও অস্থির।

নিজের অভিজ্ঞতার দিক থেকেও আমি ভ্রমণ ও লেখার সম্পর্ককে আলাদা করতে পারি না। আমার প্রথম উপন্যাস *Man in Motion* ছিল আমেরিকা ও মেক্সিকোর মধ্য দিয়ে এক যাত্রার গল্প। তারপর বহু বছর ধরে আমি ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও বিভিন্ন ইসলামি দেশে ভ্রমণ করেছি। এই অভিজ্ঞতাগুলোই আমার লেখার প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।

আজও আমি স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করি না। চলাচল, দূরত্ব, ভিন্ন পরিবেশে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি—এসবই আমার লেখার প্রধান বিষয়। গত দুই দশকে আমি বহু প্রবন্ধ লিখেছি বিদেশি স্থান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে। এগুলো প্রচলিত অর্থে ভ্রমণগাইড নয়, বরং একটি স্থানের অভিজ্ঞতা ও একজন পর্যবেক্ষকের অনুভূতি তুলে ধরার চেষ্টা।

আমার কাছে ভ্রমণ নিজেই এক ধরনের লেখা—একটি প্রাথমিক খসড়া। পৃথিবী যেন একটি শূন্য পৃষ্ঠা, আর আমি তার ওপর চলাচলের রেখা টানি। ভ্রমণের লক্ষ্য এবং লেখার লক্ষ্য এক—অন্তর্দৃষ্টি, আনন্দ, তীব্র অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কার।

আমি মনে করি, লেখার কারণ এবং ভ্রমণের কারণের মধ্যে গভীর মিল আছে। থিওডোর রোথকের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি, 'আমি সেখানে গিয়েই শিখি, যেখানে আমাকে যেতে হয়।'

মার্কিন ভ্রমণসাহিত্যিক মাইকেল মিউশ ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিন্সে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ভ্রমণ নিয়ে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি 'ট্রাভেল, ট্রাভেলার অ্যান্ড ট্রাভেল লিটারেচার' শিরোনামে রলফ পটস নামক ট্রাভেল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সেখান থেকে সংক্ষেপে অনূদিত

ভাষান্তর : আন্দামান বাগচী

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের...

মানুষের অজানাকে জানার যে আকর্ষণ, তা চিরন্তন। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে মানুষ ভ্রমণ করে। পথে পথে যে শিক্ষা ও উপলব্ধি অর্জিত হয়, তা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়

১ম পৃষ্ঠার পর

সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর *ছিন্নপত্র*, *রাশিয়ার চিঠি* *বাংলা* ভ্রমণসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের লেখার বিশেষত্ব হলো—তিনি কেবল ভ্রমণবৃত্তান্ত দেননি, পাঠককে চিন্তার খোরাক দিয়েছেন। ভ্রমণ তাঁর কাছে ছিল মানবসভ্যতা বোঝার এক মাধ্যম।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে পরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন অন্নদাশঙ্কর রায় ও দেবেশ দাস। অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে প্রবাসে* এবং দেবেশ দাসের *ইউরোপা*—দুটি গ্রন্থই ইউরোপ সফরের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁরা ইংল্যান্ডে সিভিল সার্ভিসের প্রশিক্ষণের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখেছিলেন। তাঁদের লেখার ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত, পরিশীলিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। ইউরোপের শহর, সংস্কৃতি, শিল্প, আড্ডা ও সামাজিক জীবনের বর্ণনায় তাঁরা বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন।

এ ধারায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম সৈয়দ মুজতবা আলী। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণগদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন *দেশে বিদেশে* (১৯৪৯) বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। বইটি প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল দু'টি—প্রথমত, আফগানিস্তানের মতো তৎকালীন বাঙালি পাঠকের কাছে প্রায় অচেনা এক ভূখণ্ডের জীবন ও সমাজের সঙ্গে পরিচয়; দ্বিতীয়ত, লেখকের অসামান্য প্রাণবন্ত ও রসসমৃদ্ধ কথনশৈলী।

এই বৈশিষ্ট্যই সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর লেখায় ভ্রমণ মানে কেবল পথচলা নয়; বরং মানুষ, সমাজ এবং সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করার এক আনন্দময় বৌদ্ধিক অভিযান।

তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতাও বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সমরেশ বসুর *অমৃত কুম্ভের সন্ধানে* এবং অবধূতের *মরুতীর্থ হিংলাজ* তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে রোমাঞ্চকর ও মানবিক রূপে উপস্থাপন করেছে। এসব গ্রন্থে ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি মানুষের সংগ্রাম, বিশ্বাস এবং সামাজিক বাস্তবতাও উঠে এসেছে।

নারী লেখকদের মধ্যেও ভ্রমণসাহিত্যের চর্চা উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্ময়ী দেবী তিরিশের দশকে লন্ডনে বসবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে গল্পসমূহ লিখেছিলেন, সেগুলো *বিলেত দেশটা মাটির* নামে প্রকাশিত হয়। গল্পের কাঠামো থাকলেও এগুলো মূলত আত্মজৈবনিক ভ্রমণগদ্য। সে সময় একজন ভারতীয় নারীর বিদেশে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা এত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পাওয়া ছিল বিরল।

ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাসের *লাল চীন* গ্রন্থটি বিপ্লব-পূর্ববর্তী চীনের সমাজ ও রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। একইভাবে বুদ্ধদেব বসুও ভ্রমণগদ্যে স্বতন্ত্র স্বর সৃষ্টি করেন। তাঁর *আমি চঞ্চল হে*, *সমুদ্রতীর*, *সব পেয়েছির দেশে* এবং *দেশান্তর*—এই গ্রন্থগুলোতে ভ্রমণের সঙ্গে ব্যক্তিগত অনুভূতি, সাহিত্যচিন্তা ও সমাজবিশ্লেষণ একত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। ১৯৪৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পরবর্তী বছরের ২ জুন জাহাজযোগে ভারতে ফিরে আসেন। এই সফরটি কোনো সরকারি দায়িত্বে নয়, সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগ ও ব্যয়ে করা ভ্রমণ। ফলে যাত্রাপথে খরচের ব্যাপারে তাঁর সতর্কতা ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি ইউরোপের জীবন, সংস্কৃতি ও মানুষের আচরণ গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত তাঁর বইটি প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এটি বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। সমালোচকেরা প্রায়ই অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে প্রবাসে* প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত মন্তব্য—'এ শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয়, একখানি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ' উদ্ধৃত করেন; একই মূল্যায়ন সতীনাথ ভাদুড়ীর এই গ্রন্থের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সতীনাথের ভ্রমণরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—এটি প্রচলিত ভ্রমণবৃত্তান্তের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কখনো এটি ডায়েরির মতো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিবিড় নথি, কখনো আত্মবিশ্লেষণধর্মী গদ্য, আবার কখনো গল্পের মতো কাহিনিময়। ফলে লেখাটি নিছক ভ্রমণবিবরণে সীমাবদ্ধ না থেকে একধরনের রসসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। এতে ব্যক্তিগত অনুভূতি, কৌতুক, স্মৃতি ও পর্যবেক্ষণ একত্রে মিশে গেছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই গোপাল হালদার বইটিকে তুলনা করেছিলেন এক ধরনের *A Passage to France*—এর সঙ্গে, অর্থাৎ ফরাসি সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ জগতে প্রবেশের একটি সাহিত্যিক পথ।

বাংলাদেশে ভ্রমণসাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে রাবেয়া খাতুন ও হাসনাত আব্দুল হাইয়ের লেখায়। তাঁদের ভ্রমণকাহিনিতে শুধু স্থানবর্ণনা নয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারার বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। নতুন শতাব্দীতে এসে মঈনুস সুলতান, ফারুক মঈনউদ্দীন, কামরুল ইসলাম, সেলিম সোলাইমান এবং শাকুর মজিদের মতো লেখকেরা এই ধারাকে আরও প্রসারিত করেছেন।

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভ্রমণকে জীবনের এক অনিবার্য অংশ মনে করতেন। তাঁর *ছবির দেশে কবিতার দেশে* গ্রন্থে ব্যক্তিগত স্মৃতি, ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক বিস্তৃত ভ্রমণজগৎ তৈরি হয়েছে।

মানুষের মধ্যে অজানাকে জানার যে আকর্ষণ, তা চিরন্তন। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে মানুষ ভ্রমণ করে। পথে পথে যে শিক্ষা ও উপলব্ধি অর্জিত হয়, তা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি ভ্রমণ করছে—যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ভ্রমণ মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে শেখায় এবং মানবিকতা গভীর করে। তাই ভ্রমণসাহিত্য শুধু বিনোদনের জন্য নয়; এটি মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

লেখক : ভ্রামণিক ও ভ্রমণ সংগঠক

পা ণ্ডু লি পি থে কে

সমুদ্র ও স্বাধীনতার গল্প

দানিয়েলকে দ্রুত দৌড়াতে হচ্ছিল। সমুদ্রের সামনে যা কিছু পড়ছিল, পাথর, শেওলা, সবকিছুই গিলে নিতে চাইছিল। মাঝে মাঝে সমুদ্র ধূসর ফেনার ঝাপটে দানিয়েলের পথ আটকে দিচ্ছিল। সে লাফ দিয়ে একেকটা পাথরের ওপর উঠে পড়ছিল। যখন সমুদ্র তার সব পানি নিয়ে পিছিয়ে যায়, নতুন করে সে দৌড় শুরু করে আবার। দানিয়েলকে এর মধ্যে বেশ কয়েকটা ঘোলা পানির জলাশয়ও সাঁতরে পার হতে হয়েছিল। তবে সে তখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। তার খুব আনন্দও হচ্ছিল। যেন সূর্য, বাতাস আর সমুদ্র মিলে তাকে লবণের মতো গলিয়ে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিয়েছে!

সমুদ্র তখন তার সব সৌন্দর্য মেলে ধরেছে। বিশাল ঢেউগুলো নাচের তালে তালে একবার উঁচুতে উঠছে, আবার নিচে ভেঙে পড়ছে। আর ঢেউয়ের মাথার ওপর সাদা ফেনা বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে ওপরে উঠে মেঘের মতো কিছুক্ষণ ভেসে আবার বাতাসের ধাক্কায় পিছলে নিচে পড়ছে। পানির একটা স্রোত মিলিয়ে যাওয়ার পর আবার আর একটা নতুন স্রোত আরও বেশি পানি আর গতি নিয়ে ফিরে আসছিল। অনেক দূরে পাহাড়গুলোর কাছে সৈকতের ওপর সাদা রাস্তাটা চকচক করছিল তখন। দানিয়েলের মনে পড়ছিল সিন্দাবাদের জাহাজ ভেঙে যাওয়ার গল্পটা। যেবার সমুদ্রের ঢেউ সিন্দাবাদের ভাঙা জাহাজকে রাজা মিরাজের দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল, সেই গল্প। তখন চারদিকে ঠিক এরকমই হয়েছিল। দানিয়েল পাথরের ওপর দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত দৌড়াচ্ছিল। কোনোরকম ভাবনাচিন্তা ছাড়াই ঠিক পাথরগুলোর ওপর সে খালি পা দুটো ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সে এ সমুদ্রের তলদেশের এ উন্মুক্ত জমিতে, এরকম জাহাজ ভাঙা ঝড়ের মধ্যেই সারা জীবন বসবাস করে আসছে।

দানিয়েল ঢেউয়ের গর্জন শুনতে শুনতে সমুদ্রের সাথে পাল্লা দিয়ে একই গতিতে এগোচ্ছিল, দম না ছেড়ে, একবারও না থেমে। লম্বা লম্বা ঢেউ যেন পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত থেকে আসা। মাথার ওপর সাদা ফেনা নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মসৃণ পাথরগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

দিগন্তের কাছাকাছি সূর্য স্থির হয়ে জ্বলছিল তখন। এ সূর্যই ঢেউগুলোকে শক্তি জোগায়, তার আলোই পৃথিবীর বিরুদ্ধে ঢেউগুলোকে ঠেলে দেয়। এটি এমন একটা নাচ, যা শেষ হয় না কখনো। ভাটার সময় চলে লবণনৃত্য, আর জোয়ারের পানি যখন তীরের দিকে ছুটে চলে, তখন শুরু হয় ঢেউ আর বাতাসের নাচ!

পানি সাগরতীরের কিনারায় পৌঁছে যাওয়ার পর পরই দানিয়েল তার গুহায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। গুহার নুড়িপাথরের ওপর বসে পড়ে সে, আপাতত এখান থেকেই সমুদ্র আর আকাশ দেখবে। কিন্তু ততক্ষণে ঢেউ উপকূলের বাঁধ পার হয়ে গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বাধ্য হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুহার আরও ভেতরে ঢুকে পড়ে সে। সমুদ্র তখনো ঝাপটা মেরে যাচ্ছিল, সাদা ফেনার আঘাতে গুহায় নুড়িগুলো ফুটন্ত পানির মতো কাঁপছিল। উপকূলে পাথরের বাঁধ আর একের পর এক শৈবালের বাধা ডিঙিয়ে ঢেউগুলো আরও সামনের দিকে এগুতে থাকে। দানিয়েলের আশ্রয় নেওয়া গুহার মুখে গত কয়েক মাস ধরে স্তূপ হতে থাকা লবণছাওয়া গাছের ডালগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ে পানি। গুহার একদম শেষ প্রান্তে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছিল সে। আর পিছু হটার উপায় নেই। সে পেছন ফিরে একবার দেখল, যদি সমুদ্র এবার থামে! কোনো শব্দ না করে দেহের সব শক্তি দিয়ে ধেয়ে আসা পানির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হাত দিয়ে ঝাপটা মেরে ঢেউগুলোকে পেছন দিকে ছুড়ে মারে, কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা বড় ঢেউ এসে তার সব প্রতিরোধ ভেঙে দেয়।

যে কখনও সমুদ্র দেখেনি

নূরুল আলম

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
ধরন : অনূদিত গল্প
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস

ভ্র ম ণ গ দ্য

বুখানন ও লুইনের পথে

জাকির উসমান

এই মার্চেই তিনি যাত্রা করেছিলেন গহিন অরণ্যের পথে। সালটা ১৭৯৮। পুরো আড়াই মাস ধরে ফ্রান্সিস বুখানন কুমিল্লা, নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেছিলেন। ২ মার্চ থেকে ২১ মে এই আড়াই মাস ছিল তাঁর ভ্রমণকাল। যাত্রা শুরু হয়েছিল বুখাননের কর্মস্থল মেঘনা নদীর মুখে অবস্থিত পাতাহাট থেকে। এই দীর্ঘ পথ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন নৌকায়, ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে।

ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৬২—১৮২৯) ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যানুসন্ধানী ও জরিপকারী। জন্ম ১৭৬২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি স্কটল্যান্ডে। তিনি ডাক্তারিবিদ্যা লাভ করেন এডিনবরা থেকে। তাঁর কর্মজীবন শুরু বাণিজ্যিক জাহাজের শল্যচিকিৎসক হিসেবে। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সিস বুখানন বাংলায় নিয়োগ লাভ করেন। এর আগে তিনি এশিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমুদ্র যাত্রায় বেশ কয়েকবার অংশ নেন। বার্মার রাজধানী আভাতে ক্যাপ্টেন মাইকেল সাইমসের কূটনৈতিক দলের সঙ্গেও সার্জন হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন। আভায় দায়িত্ব সম্পাদনের পর তাঁকে বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুরের কাছে পাতাহাটে নিয়োগ দেওয়া হয়। বুখানন তাঁর ভ্রমণপঞ্জিতে বাংলার উদ্ভিদ, প্রাণিকুল, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ এবং এ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন।

বুখাননের যাত্রাপথের বিভিন্ন অংশ ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে নিয়ে কখনো গিয়েছি তাঁর সেই তারাসা খালে। কখনো চকরিয়া, ঈদগাঁও, রোয়াংছড়ি। কখনো-বা কুমিল্লা হয়ে সীতাকুণ্ড-মীরসরাইয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে।

বুখাননের অনেক কাল পর পার্বত্যাঞ্চল ভ্রমণ করেন আরেক ব্রিটিশ প্রশাসক থমাস হারবার্ট লুইন। পার্বত্য চট্টগ্রামে লুইন কর্মরত ছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাঁর ভ্রমণকাল ছিল ১৮৬৫—১৮৭২। বুখাননের উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক হলেও লুইন ছিলেন ব্যতিক্রম।

চট্টগ্রাম শহরে পুলিশপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে এসেই তরুণ লুইন বেরিয়ে পড়েন পাহাড়ের পথে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ওই অঞ্চলে এর আগে পা পড়েনি কোনো ইউরোপীয়র, এক বুখানন ছাড়া। বুখানন চট্টগ্রামের দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত যাত্রা করেছিলেন, তারপর কর্ণফুলী নদী ধরে গিয়েছিলেন বরকল এলাকা পর্যন্ত। তবে তাঁর সেই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক, কোম্পানির জন্য মসলা চাষের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য। কিন্তু হারবার্ট লুইনের পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, রোমাঞ্চপ্রিয় কিশোরের মতো। ১৮৬৫ সালের নভেম্বরে প্রথমবার পাহাড়ে গিয়ে তিনি মুখোমুখি হন মুরংদের; এরপর বছরের পর বছর ধরে তাঁর অভিযান, ট্রেকিং রীতিমতো কিংবদন্তিতুল্য।

এখনো আলীকদমের গহিনে আমাদের মুরং বা ম্রোরা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ। মুরংরা অন্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে অতিথিপরায়ণ ও আন্তরিক। যতবার মুরংদের ঘরে থেকেছি, মুগ্ধ হয়েছি একইসঙ্গে তাদের সারল্য এবং দৃঢ়তা দেখে।

বুখানন বা লুইনের বর্ণনার সেই জনপদ ও প্রকৃতি-পরিবেশ আর নেই। বান্দরবানের থানচি, রুমা, রোয়াংছড়ি, কক্সবাজারের টেকনাফ, চকরিয়া, ঈদগাঁও হয়ে আলীকদম-লামা ট্রেকিং করে বুখানন-লুইনের পথের কিছু অংশ আমি নিজেও অতিক্রম করেছি।

এই পথগুলোতে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই মনে হয়েছে, যেন কেবল ভৌগোলিক কোনো পথ অতিক্রম করছি না, সময়ের মধ্য দিয়েও হাঁটছি। আলীকদমে চিম্বুক রেঞ্জের সর্বোচ্চ দুই চূড়া রুংরাং-ক্রির্সতংয়ের যে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে আমি উঠেছি, সেই ঢাল হয়তো একদিন লুইনের চোখেও ধরা পড়েছিল। তৈন বা তারাসা নামের যেসব পাহাড়ি নদীর ধারে বসে আমি বিশ্রাম নিয়েছি, তার জলের শব্দ হয়তো কোনো এক সন্ধ্যায় বুখানন-লুইনরাও শুনেছিলেন।

বান্দরবানের গহিনে গেলে আজও পাহাড়ের প্রকৃতি এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় জমে থাকে। শহরের কোলাহল এখনো সেখানে পৌঁছায়নি। সরু পাহাড়ি পথ, ঘন বন আর দূরে মেঘে ঢাকা শৃঙ্গ—সবকিছুর মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এই ভূখণ্ডের মৌলিক চরিত্র এখনো কিছুটা অক্ষত রয়ে গেছে।

একবার রোয়াংছড়ির দিকে ট্রেকিং করতে গিয়ে বিকেলের আলোয় পাহাড়গুলোকে দেখেছিলাম এক আশ্চর্য রঙে রাঙা হতে। সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। রোয়াংছড়ির টেবিল পাহাড়, দেবাছড়া পাড়া আর তারাসা খাল; বুখাননের বর্ণনা হাতড়ে বেরিয়েছি ট্রেকিংয়ে। সেইসব মুহূর্তে মনে হয়েছে, হয়তো দেড়শো বছর আগে বুখানন ও লুইনও এমন কোনো বিকেলে দাঁড়িয়ে এই একই দৃশ্য দেখেছিলেন। প্রকৃতির এই অনন্ত পুনরাবৃত্তিই ইতিহাসকে বিস্ময়জাগানিয়া ধারাবাহিকতা দেয়।

চকরিয়া, ঈদগাঁও, টেকনাফ বা নাইক্ষ্যংছড়ির দিকে গেলে ভূদৃশ্য কিছুটা ভিন্ন রূপ নেয়। সেখানে পাহাড় ধীরে ধীরে নেমে আসে সমতলের দিকে। নদী ও খালের জাল ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। বুখাননের সময়েও এই অঞ্চল ছিল জলপথে ভ্রমণের জন্য উপযোগী। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে যে নৌযাত্রার কথা পাওয়া যায়, সেই স্মৃতি মনে রেখেই আমি এ এলাকাগুলোতে ট্রেকিং করেছি। এখন আর সেই প্রাণিকুল, সেইসব সুবিশাল বৃক্ষরাজি নেই। পাথর চুরি এখন রোজকার ঘটনা। ঝিরিগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তবুও এখনো আমাদের দেশের এক দশমাংশ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম স্রেফ ‘হিডেন বিউটি’। শুধু বেরিয়ে পড়তে হবে। যান্ত্রিক বা আধুনিক জীবনের প্রায় কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে না। চলে যেতে থাকতে হবে সোজা মিয়ানমার সীমান্তের দিকে, অজস্র দুর্গম পাহাড়, অদ্ভুত সুন্দর সব ঝরনা, প্রাচীন ঝিরি আর প্রাচীন জনপদ; জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা পূরণের অবাক দুনিয়া।

লেখক : ভ্রামণিক ও সাংবাদিক

সাধ ও সাধ্যের...

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনেক বড় হয়ে এরপর যখন আমি কুয়াকাটা যাই, কাকতালীয়ভাবে সেটা এক দুর্গাপূজার ছুটিতেই যাওয়া হয়েছিল। বাস্তবের কুয়াকাটা বন্ধুর বর্ণনার মতোই সুন্দর ছিল। নীল আর কমলায় মাখামাখি সূর্যাস্ত ছিল, সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে হাত মেলে দৌড়ে যাওয়া ছোট ছেলে ছিল, বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে জ্বলতে থাকা আগুনে পোড়ানো ভুট্টা আর বাদামও ছিল। সে কী বৃষ্টি তখন! বৃষ্টির মাঝেই আমরা বাইকে চড়ে চলে আসি খাবারের খোঁজে। ছোট্ট একটা খুপড়ির মতো জায়গায় যখন আমাদের খাবার তৈরি হচ্ছিল, আমি আর আমার বোন মিলে তখন বিশাল একটা নৌকার নিচে শামুকেরা এসে জড়ো হচ্ছিল, সেটা দেখছিলাম। খাবার তৈরি হতেই আমরা টিনের চালের ঘরে মাছ আর বেগুন পুড়িয়ে সাদা ভাত দিয়ে খাই। কিন্তু সব ছাপিয়ে আমি শুধু মনে মনে ভেবেছি অবশেয়ে কুয়াকাটা আমার হলো।

এরপর ভ্রমণসাহিত্যের দেখা পাই পাঠ্যপুস্তকে। প্যারিসের রাস্তার বর্ণনা পড়তে পড়তে ভেবেছি এখানেই যেতে হবে, লন্ডনের শত সহস্র মিউজিয়ামের বর্ণনা পড়েই মিউজিয়াম ঘোরার ঝোঁক মাথায় চেপে বসেছিল প্রবলভাবে। সময়ের সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে ভ্রমণসাহিত্য খুঁজে পেয়েছি নামি লেখকের লেখায়। যেখানে ভ্রমণ নিজেই যেন এক চরিত্র হয়ে ধরা দিয়েছে। আর যতবার পড়েছি, ততবার নিজের চোখে দেখার পিপাসা বেড়ে আমার ভ্রমণের ফর্দ হয়েছে দীর্ঘ। এই ভ্রমণসাহিত্য আর সাহিত্যে ভ্রমণ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে দেশ পেরিয়ে কতদূরে। কখনো তা দেখে মন ভরেছে, কখনো কল্পনার সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন গল্পের গন্ধ।

যা যা দেখতে চাই, যা যা দেখা হয়নি, তার সবটুকু হয়তো দেখা হবে না। অর্থ, স্বাস্থ্য আর আয়ু মিলে বাধ সাধবে বারংবার। কিন্তু ভ্রমণসাহিত্য ‘হয়তো দেখা হবে’র যে স্বপ্ন তৈরি করে সেটাই বা কম কী!

তাই যখন আমি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *আ মুভেবল ফিস্ট* পড়ি, আমি ভাবি, প্যারিসে আমাকে যেতে হবেই। কিংবা যখন পাতার পর পাতা জুড়ে আমি ‘তরু’কে হাঁটতে দেখি জাপানের বরফঢাকা রাস্তা জুড়ে, আমি ঠিক করি, জাপানে না গেলে আমার চলবে না একেবারেই। অরুন্ধতী রায়ের বর্ণনা আমাকে টেনে নিয়ে যায় কেরালার বুকইয়ে পাহাড়ের মাঝে বেড়ে ওঠা এক আশ্চর্য স্কুলে। আমাকে মির্জা গালিব আর সাদাত হাসান মান্টো ডাকতে থাকেন দিল্লী আর আগ্রার অলিগলি থেকে। আর সেই কল্পনা সত্যি হয়ে যখন আমি সত্যিই বসে থাকি ফতেহপুর সিক্রির দরবার কিংবা বড় জামা মসজিদের কোনো দরজার নিচে, তখন আমি জানি, বেঁচে থাকা সার্থক।

লেখক : ইনফ্লুয়েন্সার, ‘সূচনা অলওয়েজ’

বেঙ্গলবুকস
প্র কা শি ত ক য়ে ক টি ব ই

ভ্রমণ সমগ্র
সেলিনা হোসেন
মূল্য : ৫৮০৳

দেশভাগের দুটি উপন্যাস
আবদুল মান্নান সৈয়দ
মূল্য : ৩৫০৳

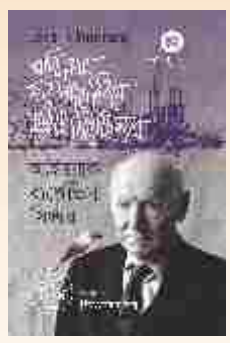
লস্ট ইন আমেরিকা
আইজ্যাক বাশেভিস সিঙ্গার
মূল্য : ৩৮০৳

চ্যাপলিনের সফরনামা
ইমরান খান
মূল্য : ২৬০৳

যেটুকু জাপান
অভিজিৎ মুখার্জি
মূল্য : ৩৫০৳

ভ্রমণে আত্মকথন ও কবি এমিলি ডিকিনসন
আনোয়ারা সৈয়দ হক
মূল্য : ৩৫০৳

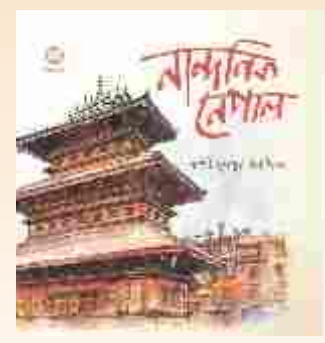
নান্দনিক নেপাল
গাজী মুনছুর আজিজ
মূল্য : ৪২০৳

+8801958519882, +8801958519883 /bengalbooks.com.bd www.bengalbooks.com.bd
স্টল নম্বর : ৬১৭—৬২১

গ ল্প

চড়ুই ও একটি তপ্ত দুপুর

দিলওয়ার হাসান

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

সেদিন স্বর্ণকমলপুরে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। মাঝদুপুরে মিনুর মনে হলো তার মাথা থেকে এক্ষুনি ঘিলু গলে পড়বে।

বাবা অফিসে। বড় আপা কলেজে। খাওয়ার পর মা মিনুকে বললেন, ‘একটু ঘুমিয়ে নাও মিনু।’

সে শুনল কথাটা, কিন্তু আমলেই নিল না। তার ঘরে গিয়ে ছবি আঁকতে বসল। গাঢ় সবুজ আর লাল রং দিয়ে মস্ত একটা টিয়েপাখি আঁকল।

টিয়ে মিনুর প্রিয় পাখি। তার পীড়াপীড়িতে বাবা ওকে একটা টিয়ে কিনে দিয়েছিলেন। বারান্দায় একটা বাঁশের খাঁচায় রেখে পালত। পাখিটা বাড়িতে আসার পর মিনুর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় একেবারে। এমনকি পড়ালেখাও। সারাক্ষণ টিয়ে নিয়ে থাকত। তাকে খাওয়াত, গোসল করিয়ে দিত আর অনর্গল কথা বলত ওর সঙ্গে। মিনু টিয়েটার নাম দিয়েছিল রিংকু।

একদিন টিয়েটাকে বলল, ‘জানিস রিংকু, আমার মেয়েটাকে রুম্পার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। তুই কী বলিস?’ রিংকু খুব করে ডানা ঝাপটে বলল—টিই টিই টিই...

মিনু খুশি হয়ে ভাবল ও রাজি আছে এ বিয়েতে। মিনু ওকে অনেক কথা বলতে শিখিয়েছিল। পাখিটা ওকে ডাকত ছোট আপু।

তার এই অতিশয় টিয়েপ্রীতি বাড়ির সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছিল। মা আর বড় আপা বকা দিলেন একটুখানি। তাতে কাজ না হওয়ায় বাবাও একটুখানি গালমন্দ করলেন; কিন্তু টিয়ে থেকে মিনুকে সরানো গেল না।

কী করবেন ভেবে না পেয়ে মা একদিন রেগেমেগে খাঁচার দরজা খুলে দিলেন। স্কুল থেকে এসে মিনু যখন দেখল টিয়ে নেই, খুব কান্নাকাটি করল, তারপর এক সময় সব ভুলে গেল...

আঁকা শেষ করে মিনু খাটের ওপর কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে একটা গানের ক’টা লাইন গাইল—নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল, বসন্তে সৌরভে শিখা জাগল। মিনুর গলা ভালো, তবে গানের প্রতিযোগিতায় সব সময় থার্ড হয়। বন্ধুরা ওকে থাড্ডু বলে খেপায়। তার এই থার্ড হওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ সম্ভবত সে কঠিন কঠিন সব গান করে। গতমাসে যে-প্রতিযোগিতাটা ওদের স্কুলে হয়ে গেল সেখানে মিনু গেয়েছে—আমার ঘুর লেগেছে—তা ধিন্ তা ধিন্। তোমার পেছন পেছন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তা ধিন্ তা ধিন্। রবীন্দ্রনাথের গান।

এইসব কঠিন গানের জন্যে মিনু অবশ্য দায়ী নয়, সে গায় তার সংগীত শিক্ষক কালিনারায়ণ বাবুর নির্দেশে। কালিবাবু গুরুগম্ভীর আর কড়া ধাঁচের মানুষ। তাঁর কথার ওপর কথা বলতে পারে না কেউ।

গান শেষ করে মিনু ডাইনিং টেবিলে রাখা তেঁতুলের আচারের বয়াম থেকে একটুখানি আচার খেয়ে পায়চারি করতে লাগল, আর তখনই একটা পাখির কিচিমিচি কিচ কিচ শব্দ ভেসে এলো তার কানে। এ কোন পাখি ডাকে? মিনু বারান্দায় গেল, আশেপাশে তাকাল, কোনো পাখি তার চোখে পড়ল না। তবে শব্দ কানে আসছে—কিচিমিচি কিস কিস, কিচিমিচি কিস কিস।

কী পাখি? কোথায় বসে ডাকছে? মিনু কান পেতে শব্দটা শুনতে লাগল, তার চোখ দুটো উৎসুক হয়ে পাখিটা খুঁজে চলল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল—একটা ঘুড়ির সুতোর সঙ্গে একটা চড়ুইয়ের পা আটকে গেছে ইলেকট্রিকের তারে।

মিনু ওদের বাসার আঁশ পরিষ্কার করার লম্বা লাঠিঠা নিয়ে চড়ুইয়ের পা থেকে সুতো ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবল, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত তার হাত পৌঁছাল না। সে তখন আছিয়ার মাকে ডাকার কথা ভাবল। সে লম্বা মানুষ, তার হাত দুটোও লম্বা।

মিনু চিৎকার করে বলল, ‘শিগ্‌গির এসো আছিয়ার মা, ইলেকট্রিকের তারে একটা পাখি আটকা পড়েছে, লাঠি দিয়ে ছাড়িয়ে দাও।’ আছিয়ার মা তখন ঘুমে একেবারে কাদা। সে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, ‘এলেকটারির লাইন আচে তো, ফ্যান ঘুরতে আচে।’

আরে ধ্যাৎ! মিনু জোরে একটা ধমকানির শব্দ করে মায়ের ঘরে গিয়ে বলল, ‘মা ওঠো তো শিগ্‌গির, একটা পাখি...’ মা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে ধমকের সুরে বললেন, ‘তুই এখনও জেগে আছিস? ঘুমাগে যা। জলদি।’

মিনু আবার বারান্দায় গেল। পাখিটা আরও জোরে জোরে চিৎকার করছে। নাটাই-ছেঁড়া ঘুড়ি, সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া থাকে, পাখির পা কেটে নিশ্চয় খুব রক্ত বেরোচ্ছে।

মিনুর মায়া হচ্ছিল খুব। কী করা যায় এখন? সে কি রাস্তায় নেমে চিৎকার করবে? কিন্তু তাতে কী হবে? এত ওপরে উঠে ইলেক্‌ট্রিকের তার থেকে পাখিটা নামাবে কী করে? এত বড় মই তো কারও কাছে নেই!

সে ঘরে গেল, জগ থেকে পানি গড়িয়ে খেল। আবার বারান্দায় এলো। একটুখানি পায়চারি করল; হঠাৎ তার মনে পড়ল ফায়ার সার্ভিসের কাছে লম্বা মই থাকে, তারা পাখিকে নামিয়ে আনতে পারবে।

সে তার মায়ের ফোনটা নিয়ে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে বলল, ‘আপনাদের লম্বা মইটা নিয়ে শিগ্‌গির আসুন, একটা চড়ুই পাখি ইলেকট্রিকের তারে আটকে পড়েছে।’ ফোনটা ধরেছিলেন যে কর্মকর্তা, তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘মা-মণি তোমার নাম আর ঠিকানা বলো, আমরা আসছি।’

মিনু গালে হাত দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তায় লোকজন গাড়ি ঘোড়া নেই একেবারে। গরমে জেরবার শহরবাসী। জরুরি কাজ না থাকলে কেউ বাইরে বেরোচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাইরেন বাজাতে বাজাতে ফায়ার সার্ভিসের দুটো গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো। ভাতঘুমের ভেতরে ছিল যারা তাদের ঘুম গেল টুটে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির শব্দ শুনে তারা ভাবল আগুন লেগেছে। সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলো।

রাস্তায় নেমে এলো মিনুও। ততক্ষণে মই বেয়ে ওপরে উঠে পাখিটা নিয়ে নিচে নেমে এসেছেন দুজন অগ্নিনির্বাপণকর্মী। তারা চড়ুইয়ের পায়ে পেঁচিয়ে থাকা অনেকখানি সুতো খুলে ফেললেন।

উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন স্বর্ণকমলপুর জেলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার ফাহিম হোসেন। জীবনে তিনি অনেক উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু এরকম ঘটনা তিনি এই প্রথম শুনলেন। ফলে খুব কৌতূহল নিয়ে উদ্ধার টিমের সঙ্গে চলে এসেছেন। তিনি ছাড়াও তার দলে ছিলেন দশজন দক্ষ অগ্নিনির্বাপণ কর্মকর্তা। দলনেতা মিনুকে খুঁজে বের করে চড়ুইটা তার হাতে দিয়ে বললেন, ‘এই নাও মা-মণি, তোমার পাখি।’

মিনু হেসে বলল, ‘আমার পাখি নয়, এটা সবার পাখি। আমি তো ভয়ে ভয়ে ফোন করেছিলাম। আগুন লাগলেও অনেক সময় ফোন করে পাওয়া যায় না আপনাদের, এটা তো সামান্য একটা চড়ুই পাখিকে বাঁচানোর অনুরোধ ছিল।’

এ কথা শুনে ফাহিম হোসেন বললেন, ‘ফায়ার সার্ভিস এখন লাইফ সেভিং ফোর্স। শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর জীবনের মূল্য আছে। তাদের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এরকম মনোভাব নিয়েই এখন আমরা কাজ করি। ছোট্ট চড়ুই পাখিটার জীবন রক্ষা করতে পেরে আমরা আনন্দিত।’

চড়ুই উদ্ধার অভিযানের খবর শুনে ওখানে এসে হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় বার্ড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অনুপম রায়হান। তিনি বললেন, ‘পাখি মারার ঘটনায় পুলিশ ডাকলে লোকে হাসাহাসি করে। বলে কী হয় পাখি মারলে? এজন্যে পুলিশ ডাকতে হবে? এরকম যখন অবস্থা তখন পাখির প্রাণ রক্ষায় ফায়ার সার্ভিসের ছুটে আসা ও উদ্ধার অভিযান চালানোটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনা থেকে সবারই শেখবার আছে—কারো জীবন বাঁচাতে সবারই ছুটে যাওয়া উচিত, ক্ষুদ্র একটা প্রাণী হলেও।’

বাড়ির সামনে হট্টগোলের শব্দ পেয়ে ভাতঘুম থেকে জেগে উঠলেন মিনুর মা। কোথাও মিনুকে খুঁজে না পেয়ে দ্রুত নিচে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, পাড়ার কয়েকজন লোক মিনুকে মাথায় নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে নাচছে। কিছু বুঝতে না পেরে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন...

কিন্ডারবুকস প্রকাশিত শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু বই

স্টল নম্বর ৮১, ৮২, ৮৩

ছোট্ট ইঁদুর দেখবে সাগর
আসাদ চৌধুরী
মূল্য : ১৪০৳

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড
লুইস ক্যারল
মূল্য : ১৪০৳

আ ক্রিসমাস ক্যারল
চার্লস ডিকেন্স
মূল্য : ১৪০৳

গালিভার’স ট্রাভেলস
জোনাথন সুইফ্‌ট
মূল্য : ১৪০৳

ট্রেজার আইল্যান্ড
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
মূল্য : ১৪০৳

রবিনসন ক্রুসো
ড্যানিয়েল ডিফো
মূল্য : ১৪০৳

ডারউইনের অভিযান
আবদুল্লাহ আল-মুতী
মূল্য : ২৫০৳

/kinderbooksBD   www.kinderbooks.com.bd   বই পেতে কল করুন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮১, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাতিয়ার ভ্যান-চালক...

মুক্তারিয়া পৌঁছে তাঁবুতে শুয়ে মেরুদণ্ডের টুকরোগুলো সমান্তরাল রাখার চেষ্টা করলাম। ভ্যান-চালকের কথা তখনও করোটিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার কথার মর্মার্থ ছিল, ভাঙা রাস্তা সারার কেউ যেহেতু দেশে নাই, তাই কষ্ট লাঘবের জন্য নিজেরা যা পারি তাও করব না। কত সময় যে আমার নিজের ভাবনাচিন্তাও এই একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে সে কথা স্মরণ করে মেরুদণ্ডের দুর্বলতাটা গভীরতর মনে হলো।

পাখি-রক্ষার কথা উঠলে আমরাও তো বলি, 'আমরা আর কী করতে পারি! সারা পৃথিবীতেই পাখি ধ্বংস হচ্ছে।' প্রতিদিন বন-বাদাড় লোপাট হচ্ছে, জলাভূমি ভরাট হচ্ছে, ঘাস-বন আবাদ হচ্ছে, পাহাড়ে-প্রান্তরে লোকালয় গড়ে উঠছে। শেষ হচ্ছে পাখির বিচরণভূমি ও প্রজনন এলাকা। অনেক পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক পাখির সংখ্যা এত কমে গেছে যে অদূর ভবিষ্যতে এরাও শেষ হবে।

এশিয়া মহাদেশেই এখন পাখি সবচেয়ে দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে। দ্রুত গতিতে এ মহাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। এখন চীন ও ভারতে হচ্ছে। দ্রুত ধাবমান উন্নয়নের চাকা পাখির আলয় ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। সংরক্ষণের জন্য সুশীল সমাজের কণ্ঠ জোরালো হওয়ার আগেই পাখি শেষ।

বিশ্বে এখন বিলুপ্তির মুখে আছে শতাধিক প্রজাতির পাখি। এর পঁয়ত্রিশটি প্রজাতি বাংলাদেশে আছে। এর সাত প্রজাতির পাখি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ খুবই বড় অবদান রাখতে পারে। এদের ব্যাপারে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু সে কথা আমরা প্রায়ই তেমন জোর দিয়ে বলি না।

ধরে রাখার জন্য সবাই উঠে-পড়ে না লাগলে যে পাখি অচিরে বিলুপ্ত হবে তাকে 'মহাবিপন্ন' বলা হয়। বিশ্বের পাঁচটি মহাবিপন্ন পাখি আমাদের পিতা-পিতামহের আমলে বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের নাম গোলাপি-হাঁস, বাংলা-ডাহর, ধলাপেট-বক, সরুঠুঁটি-শকুন ও রাজ-শকুন। গোলাপি-হাঁস ছাড়া বাকি চার জাতের পাখি পৃথিবীর কোথাও কোথাও এখনও টিকে আছে। তবে বাংলাদেশে এদের আর কোনো আশা নেই।

বিশ্বের দুটি মহাবিপন্ন পাখি আজও বাংলাদেশে টিকে আছে, নাম বাংলা-শকুন এবং চামচঠুঁটো-বাটান। এই উপকূলের কাদাচরেই টিকে আছে চামচঠুঁটো-বাটান। নিঝুমদ্বীপ ও দমারচরেও এ পাখি দেখা গেছে। তবে সোনাদিয়ার কাদাচরেই এ পাখি বেশি দেখা যায়। চামচঠুঁটো-বাটান রক্ষার জন্য সোনাদিয়ার লবণ-চাষ ও চিংড়ি-ঘের করা, পাকা বাঁধ দেয়া এবং পোর্ট বানানোর বিপক্ষে আমরা জনমত গড়ে তুলতে পারি।

মহাবিপন্ন পাখির চেয়ে কিছুটা কম বিপদে রয়েছে যে পাখি তার খেতাব 'বিপন্ন'। এদের সংরক্ষণের জন্য মানুষের হাতে একটু বেশি সময় আছে। বিশ্বের চার প্রজাতির বিপন্ন পাখি বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়েছে। এদের নাম সবুজ-ময়ূর, বাদি-হাঁস, ধলা-শকুন ও বড়-মদনটাক।

বিশ্বের যে তিনটি বিপন্ন পাখি এদেশে আজও টিকে আছে তার নাম বেয়ারের-ভুতিহাঁস, নর্ডম্যান-সবুজপা ও কালামুখ-প্যারাপাখি। কিছু সংখ্যক বেয়ারের-ভুতিহাঁস শীতে টাঙ্গুয়া, পাশুয়া ও হাকালুকি হাওড়ে বাস করে। সোনাদিয়া, দমার-চর ও উপকূলের অন্যান্য চর নর্ডম্যান-সবুজপা পাখিদের শীতের আবাস। কালামুখ-প্যারাপাখির জন্য সুন্দরবনের চেয়ে ভালো বাসস্থান বিশ্বে আর নেই। এইসব হাওড়, চর ও বন সংরক্ষণের পক্ষে আমরা কি জনমত গড়ে তুলতে পারি না!

বিপদের ভয়াবহতার দিক থেকে আর এক ধাপ নিচে রয়েছে যে পাখি তাকে 'সংকটাপন্ন' বলা হয়। বিশ্বের চার প্রজাতির সংকটাপন্ন পাখি বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি হারিয়ে গেছে। এদের নাম বাদা-তিতির, দেশি-সারস, শতদাগি-ঘাসপাখি ও কালাবুক-টিয়াঠুঁটি। বারো প্রজাতির বৈশ্বিক সংকটাপন্ন পাখি বাংলাদেশে এখনও টিকে আছে। এর মধ্যে চার জাতের পাখি রক্ষা করার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে আমাদের। এ পাখিদের নাম দেশি-গাঙচষা, ছোট-মদনটাক, পালাসি-কুরাঈগল ও বড়-গুটিঈগল।

বিশ্বে দেশি-গাঙচষার সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম এবং ক্রমে তা আরো কমছে। হাতিয়া ও নিঝুমদ্বীপের মাঝে বয়ে যাওয়া মুক্তারিয়া-খাল আর তার পুবে সদ্য জেগে-ওঠা দমার-চরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশি-গাঙচষার বাস। এখানে টিকে না থাকলে পাখিটি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে বাধ্য। নিঝুমদ্বীপকে 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' ঘোষণা করে সরকার এসব অঞ্চল সংরক্ষণের কাজে হাত দিয়েছে। এ কাজে সমর্থন ও সহায়তা দেওয়ার একটা দায়িত্ব আছে আমাদের।

ছবি : ইনাম আল হক

বড়-মদনটাক চিরবিদায় নিলেও ছোট-মদনটাক বাংলাদেশে আজও টিকে আছে। মদনটাকই বাংলাদেশের বৃহত্তম পাখি এবং সুন্দরবনের বিশাল বাদাভূমি ছাড়া এর টিকে থাকার উপায় নেই। এ পাখি দক্ষ শিকারি নয়, কুড়িয়ে খায়; মৃত মাছ, সরীসৃপ ইত্যাদি খেয়ে বাদাবন সাফ রাখে। সুন্দরবনের পানিতে বিষ, তেল ও অন্য বর্জ্য ফেলার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব বন বিভাগের। তবে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজটি কিন্তু আমাদের সবার।

বৈশ্বিক সংকটাপন্ন দুই প্রজাতির ঈগল শীতে বাংলাদেশে বাস করে। এদের নাম পালাসি-কুরাঈগল ও বড়-গুটিঈগল। সিলেট বিভাগের হাওড় অঞ্চলেই এদের বেশি দেখা যায়।

লেখাটির বাকি অংশ
পড়তে স্ক্যান করুন

শেষ পৃষ্ঠার পর

উজবেকিস্তানের অন্তরমহল

প্রেমবচন—'গালে কালো তিল সেই সুন্দরী, স্বহস্তে ছুঁলে হৃদয় আমার/বুখারা তো ছার, সমরখন্দও খুশি হয়ে তাকে দেব উপহার।' এরপর পড়েছি ইতিহাসের বইপত্রে, তাসখন্দ চুক্তি প্রসঙ্গে।

ইতিহাসপ্রিয়তার ছোঁয়া তাসখন্দসহ গোটা দেশে বিস্তৃত। সিল্করুটের ইতিহাসঋদ্ধ মধ্য এশিয়ার এই দেশটি যেন আমির তিমুর অর্থাৎ হ্যারল্ড ল্যাম্বের 'দিগ্বিজয়ী তৈমুর' বন্দনায় ব্যস্ত। তাঁকে নিয়ে বহির্বিশ্বে আর ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাতায় যাই লেখা থাকুক না কেন, বর্তমান উজবেক জাতি যেন তাঁর মহিমা কীর্তনে রাষ্ট্রীয়ভাবে পণবদ্ধ। অবশ্য তাঁর ইহজাগতিক পৌত্র উলুক বেগের ভাস্কর্যও চোখে পড়ে কোথাও, তার সঙ্গে তৈমুরের মিলের কারণে কোনটা দাদা আর কোনটা নাতি—এ নিয়ে বিভ্রান্তিতেও ভোগেন অনেকে; অবশ্য দুজনায় ফারাকও কম নয়। একজনের ছিল জগৎজয়ের নেশা আর অন্যজনের অপার আগ্রহ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, সূর্যঘড়ি, মানমন্দির আর ত্রিকোণমিতিতে।

রসস্রষ্টা নাসিরউদ্দিন হোজ্জাসহ সমস্ত জাতীয় গৌরববাহকদের বিচিত্র সব ধাতব ভাস্কর্য দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম ভাস্কর্যবিরোধী রক্ষণশীলদের তোয়াক্কা না করে মুসলিমপ্রধান উজবেক দেশের ঐতিহ্যচর্চার ধারা নিয়ে। বোখারাতে আমাদের হোটেলের সামনের পার্কটাই দেখলাম হোজ্জার ভাস্কর্যসূত্রে ইউনেস্কোর বিশ্ব-ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত এলাকা। এমন ঐতিহ্য ছড়ানো-ছিটানো এদেশের পথে-প্রান্তরে। পাশাপাশি প্রাচীন মসজিদ, মাদ্রাসা, গির্জা, জাদুঘরের পর জাদুঘর, ক্যারাভান সরাই, ইহুদিপাড়া—সব মিলেমিশে আক্ষরিক অর্থেই উদারতার আবহে স্নাত যেন বোখারার মতো উজবেক শহরগুলো। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক প্রকার সমন্বয় যেকোনোভাবেই হোক তারা সম্ভব করেছে। ইমাম বোখারিসহ ধর্মীয় শ্রদ্ধেয়জনদের মাজারে পরিপূর্ণ একটি দেশ—তবে কোথাও মাজার ঘিরে উৎকট কোনো ব্যাপার চোখে পড়ে না।

খিভা থেকে সড়কপথে বোখারা যাওয়ার পথে পড়ে ঐতিহাসিক খিজিলখুম মরুভূমি, আমুদরিয়া, শিরদরিয়া। মুহূর্তেই মনে আসে কবি আলিশের নওয়ারির কথা, তাঁর লাইলি মজনু-শিরি ফরহাদ উপাখ্যানের অঞ্চল তো এটাই। মিহি রোদ্দুর আর হাওয়ার দুপুর যেন তাদের প্রেমের কুঁড়ি মেলে ধরছিল দূরদেশি আমাদের কাছে। বোখারায় ঐতিহাসিক কালান মিনার (এক সময় সুউঁচু এই মিনার থেকে আমিরেরা অপরাধীদের নিচে ছুড়ে ফেলতেন বলে এ মিনার 'মৃত্যুমিনার' নামেও পরিচিত)। যদিও এটি বোখারায় তবু উজবেক শহরের এই মিনার দেখেই মনে পড়ল ভূপেন হাজারিকার গানের সেই পঙ্‌ক্তি—'গালিবের শের তাসখন্দের মিনারে বসে শুনেছি।' সমরখন্দের রেগিস্তান স্কয়ারে কিছুদিন আগেই হয়ে গেল 'হই চই আনলিমিটেড'-এর শুটিং। বাংলা ছবির এই উজবেক ভ্রমণ কেবল শুটিং স্পট হিসেবেই নয়, যৌথ প্রযোজনা এবং ভাষারও। উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার চারটি দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসয়ুদ মান্নান জানালেন চলচ্চিত্র, নাটকের মানুষজনসহ উপমহাদেশের অনেকেই এখন ঘুরতে আসেন এই অসাধারণ নিসর্গ ও ইতিহাসের দেশে।

বোখারার শীতপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। একদা এখানেই বন্দি ছিলেন তাজিক কবি সদরুদ্দিন আইনি, যিনি *সেকালের বোখারা* নামে রচনা করেছিলেন এক মনোহর গ্রন্থ, যা রুশ থেকে বাংলায়ও অনুবাদ হয়েছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র উজবেকিস্তানের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে যোগ করেছিল নতুন মাত্রা। সোভিয়েত ভেঙেছে তিন দশকও হয়নি, অথচ সোভিয়েত কতটা খারাপ ছিল সে প্রশিক্ষণ মনে হয় সমস্ত গাইড ও ট্যুর অপারেটরকে বাধ্যতামূলকভাবে দিয়ে রেখেছে উজবেক কর্তৃপক্ষ।

আমাদের গাইড আবদুল্লাহ এমনিতে সংস্কারমুক্ত, বুদ্ধবাদে আগ্রহী আর সোভিয়েত বিরোধিতায় ব্যাপক উৎসাহী। তবে ভ্রমণের শেষভাগে তাসখন্দ থেকে দূরে বরফগলা পাহাড়ি এলাকায় রোপওয়েতে অনেকেই যখন উঠতে ভয় পাচ্ছে, তখন তার মুখ থেকে যেন অবলীলায় বেরিয়ে এলো, 'ভয় পেয়ো না, এটা সোভিয়েত আমলের তৈরি। সোভিয়েত আমলে তৈরি সবকিছুই মজবুত ও নির্ভেজাল।' অবশেষে বলল আবদুল্লাহ, চাপিয়ে দেওয়া রুশিকরণ আর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ব্যতীত বৈষম্যমুক্ত সমাজসহ অনেক কিছুই সোভিয়েত দিয়েছে তাদের। বিশেষত সেসময় বহু বিশ্ব সম্মেলনের ভেন্যু নির্বাচন করায় তাসখন্দ পেয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবের খ্যাতি একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। তার কথার সত্যতাও খুঁজে পাওয়া গেল উজবেক রাজধানীতে। নারীস্বাধীনতা এখানে কেবল নৃত্যের ছন্দেই নয়, ধর্মীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দোকানবাজার সর্বস্থলে তাদের অবাধ চলাফেরাতেও প্রতীয়মান। আর তাসখন্দের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সংযোগ এ শহরকে দিয়েছে অনন্য মহিমা। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে এ শহরে বাস করেছেন তলস্তয়, সের্গেই এসেনিন, এবং আন্না আখমাতোভা। পাতাঝরা মায়াবী এলাকায় লিও তলস্তয়ের তাসখন্দ অবস্থানকালীন ভবনটার সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব হলো এর অন্ধকার বিজনে বসেই যেন তিনি লিখে চলেছেন আলোপৃথিবীর গল্প-উপন্যাস। তাসখন্দের ইউরোপীয় বাজারের পথে পথে বিক্রি হতে দেখলাম মার্কস, এঙ্গেলস, স্টালিন, লেনিনের ছবি। হয়তো হালের পুঁজিতান্ত্রিক উজবেকিস্তান তার হিম-ঠান্ডায় উষ্ণতা খুঁজছে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে। বিপ্লব বসত করে সড়কে, বাস্তবে না হলেও—মনের মাটিতে।

দূরত্বের কারণে আমাদের যাওয়া হল না কেবল আন্দিজান, ফারগানা। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের জন্ম ও সমাধিভূমিতে। যদিও পিরিমকুল কাদিরভের বাবর বইটা সঙ্গ দিচ্ছিল বিমানে এবং উজবেক হোটেলগুলোতে।

লেখক : কবি

মোঘল হাম্মাম
বাংলাদেশের সাত প্রাচীন স্নানঘর

ভ্র ম ণ গ দ্য

এলিজা বিনতে এলাহী

একজন ভ্রমণকারী হিসেবে আমার কাছে বাংলাদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে যে দুটি প্রশ্ন সবাই জানতে আগ্রহী থাকে তা হলো—বাংলাদেশে আমার প্রিয় ভ্রমণস্থল আর অন্যটি হলো আমার প্রিয় স্থাপত্য। দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া আমার জন্য বেশ জটিল। বাংলাদেশে আমার পছন্দের অনেক ভ্রমণস্থান যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পছন্দের স্থাপত্য।

মোটা দাগে যদি বলি পুরো উত্তরবাংলার ১৬টি জেলাকে আমার 'হেরিটেজ জোন' বলে মনে হয়। এই ভূখণ্ডের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে রয়েছে ইতিহাস আর সমৃদ্ধি। প্রিয় স্থাপত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশে টিকে থাকা সাতটি মোঘল হাম্মামখানা।

ভ্রমণকারী হিসেবে আমি জনপ্রিয় কেউ নই এবং আমার কাজ সম্পর্কে খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষই জানেন। তাই অল্প করে নিজের কাজ ব্যাখ্যা করি। আমি নিজেকে একজন ভ্রমণ অনুরাগী মনে করি এবং সেই সাথে ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে রয়েছে আমার সখ্য। ভ্রমণ ও ইতিহাস কবে মিলেমিশে আমার মাঝে হেরিটেজ ট্রাভেল কিংবা ঐতিহ্য ভ্রমণের রূপ ধারণ করেছে তা আসলেই আমার জানা নেই। তবে ভ্রমণ, প্রত্নস্থল, যেকোনো অঞ্চলের ইতিহাস অনুসন্ধান আমার মনজমিন ও দেহে এখন লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকার মতোই প্রবাহিত হয়। দেশপ্রীতি কিংবা অঞ্চলপ্রীতি থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশে আমার হেরিটেজ ট্যুরিজম বিকাশের কাজ যা আজও চলমান। হেরিটেজ ট্যুরিজমের পথে চলতে চলতে দেখা পাই আমাদের ভূখণ্ডের হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস।

সাতটি মোঘল হাম্মামখানা দেখবার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা অল্প পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব নয়, কষ্টসাধ্য। কারণ এই পুরো বিষয়টি আলাদা করে মলাটবদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে। তারপরও সাতটি হাম্মামখানার সাথে আগ্রহীদের পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

গল্প শুরু করছি ঢাকার দুটি হাম্মামখানাকে ঘিরে। গল্প শুরুর আগে, আমার মতো যারা হাম্মামখানা সম্পর্কে কম জানেন তাদের জন্য এর ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে অল্প আলাপ করছি।

হাম্মামখানা আসলে কী?

হাম্মামখানা আমাদের কাছে খুব একটা পরিচিত শব্দ নয়। এটি একটি ফার্সি শব্দ। যার অর্থ স্নানাগার। মুসলিম সভ্যতায় প্রথম স্নানাগার বা হাম্মাম নির্মিত হয় এশিয়া মাইনর অঞ্চলে। তুরস্ক এবং পারস্যে এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। উমাইয়া যুগে নির্মিত 'কুসায়ের আমরা প্রাসাদ' সংলগ্ন হাম্মামটি মুসলিম সভ্যতার প্রথম স্নানাগার। এর নির্মাণকাল ৭১২—৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ। তুর্কিদের সংস্পর্শে এসে এই ধারণা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে যায় এবং সেখানে তা 'তার্কিশ হাম্মাম' নামে পরিচিতি পায়। মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য ও তুর্কি সংস্কৃতিতে হাম্মাম শুধু গোসলের স্থান ছিল না, এটি ছিল সামাজিক আড্ডা, বিশ্রাম ও পরিচ্ছন্নতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভারতীয় উপমহাদেশে হাম্মাম সংস্কৃতি মূলত মোঘলদের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়। মোঘল সম্রাট ও অভিজাতদের প্রাসাদে উন্নত প্রযুক্তির হাম্মামখানা নির্মিত হতো। এসব হাম্মামে গরম ও ঠান্ডা পানির আলাদা ব্যবস্থা, বাষ্পঘর এবং মেঝের নিচে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করার বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতো। অনেক সময় হাম্মামের দেয়াল ও মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হতো।

মধ্যযুগে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হাম্মামের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে প্রকার ও আকারে ভিন্নতার পরিচয় মেলে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর হাম্মামখানায় দরবার বসাতেন। সে থেকেই বোঝা যাচ্ছে হাম্মামখানার আয়তন বা আকৃতি কত সুবিশাল ছিল। হাম্মামের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো—কফি পান, বিশ্রাম, শৌচকার্য, নামাজ ইত্যাদি। উপমহাদেশে অধিকাংশ হাম্মামখানা আমির-ওমরাহ ও রাজপরিবারের সদস্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো।

লালবাগ প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরে

ঢাকার লালবাগ এলাকায় লালবাগ কেল্লা মূলত একটি জলদুর্গ, যা নির্মাণ করা হয়েছিল ঢাকাকে সুরক্ষিত করবার জন্য। প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরে দ্বিতল একটি ভবনের ভেতরেই রয়েছে হাম্মামখানাটি। দুর্গ তৈরির কাজ যে শাসক শুরু করেছিলেন, তিনি থাকতেন চাঁদনী বজরায়। বুড়িগঙ্গাপারের যে জায়গাটা বর্তমানে চাঁদনী ঘাট নামে পরিচিত, সেখানেই নোঙর করা থাকত এই নৌকা। দিনের বেলা এসে নির্মাণকাজ তদারক করতেন তিনি। এখানে অফিস করতেন। তাঁর গোসলের প্রয়োজন হতো, শৌচাগার ব্যবহারের দরকার পড়ত। সে কারণে প্রথমেই তিনি তৈরি করান গোসলখানা। মোঘলরা যাকে বলত হাম্মামখানা। হাম্মামখানায় গরম পানি ও ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হাম্মামখানার সামনের দ্বিতল ভবনটা দেওয়ান-ই-আম বা দরবার হল। আমজনতার সঙ্গে বৈঠক হতো বলেই এমন নাম। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকে লালবাগের কেল্লা হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সেনানিবাস। পাকিস্তান আমলের এই স্থাপত্যের কিছু পরিবর্তন ঘটে। প্রায় ১৫/২০ বছর হাম্মামখানাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে ও দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

জিঞ্জিরা প্রাসাদের হাম্মামখানা

ঢাকার অদূরে জিঞ্জিরা প্রাসাদের হাম্মামখানাটির দুটি কক্ষই কেবল অবশিষ্ট রয়েছে। একটিতে একজন বৃদ্ধা ভাড়া থাকেন। অন্য কক্ষটি কোনো পরিবারের রসুইঘর। সেখানে রান্না হচ্ছে। রসুইঘরের পাশেই ময়লা ফেলার স্থান।

লেখাটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভ্রমণ মানে পৃথিবীকে...

কলকাতা দিয়ে ভ্রমণ শুরু করি। এরপর তো অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল। অনেকগুলো দেশ ঘোরা হয়েছে। ৩০টিরও বেশি।

এখন আমি যখন ঘুরেছি তখন শুধু চারপাশের দৃশ্য দেখেছি এমন না; বরং আশপাশের মানুষ এবং প্রাণের যে বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা তা দেখার চেষ্টা করেছি। একটা নদী দেখলে সেটাকে শুধু নদী বলে বিচার করার সুযোগ আসলে নেই। ভ্রমণের মাধ্যমে যে অচেনাকে দেখছি, তার মধ্যে নিজেকেও দেখা হয়। নিজের যা অচেনা বা পরিচিত নয় সেটুকুকে ধারণ করা যায় ভ্রমণের মাধ্যমে।

ঘোরাঘুরি ইচ্ছেটাকে যে লেখার রূপ দেওয়া যায় এ ভাবনা এলো কীভাবে? এমনিতে আপনার ভ্রমণ নিয়ে লেখার ধরনটাও আলাদা। ভ্রমণসাহিত্য সম্পর্কে আপনার ভাবনাটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলুন।

শাকুর মজিদ : ঘোরাঘুরি শুরু করার পর অনেক অভিজ্ঞতা তো হচ্ছিল। এক সময় মনে হলো, এ অভিজ্ঞতাগুলোকে শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভেবে সঞ্চয় করলে চলবে না। এগুলোকে লেখায় রূপ দেওয়া যায়। আমার অবশ্য লেখালেখি শুরু হয় নাটক লেখার মাধ্যমে। ভ্রমণ করতে গিয়ে তো অনুধাবন করলাম যে এখানে অনেক কিছুই আছে যা উপস্থাপন করা যায়। আর ওই সময় পত্র-পত্রিকাতেও ভ্রমণকাহিনির অনেক চাহিদা ছিল। পাঠকেরও আগ্রহ দেখলাম। তাই লেখার আগ্রহ তৈরি হলো। ভ্রমণ অনেক শ্রমলব্ধ কাজ। আরও শ্রমলব্ধ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে নিরপেক্ষ ও নির্ভুলভাবে তুলে ধরা। তখন থেকেই ভ্রমণ নিয়ে লেখাটা অভ্যাস হয়ে যায়। এরপর তো অন্তত ১৯টা ভ্রমণ বিষয়ক বই লিখেছি। কথাপ্রকাশ থেকে সমগ্রও বেরিয়েছে। আমি নাটক বাদে মূলত স্মৃতিকথা আর ভ্রমণকথাই লিখেছি। কারণ আমার ব্যস্ততার সঙ্গে এ ধরনের লেখাই বেশি খাপ খেয়েছে।

আপনার কাছে তো ভ্রমণ নিয়ে লেখাটা শুধু ঘোরাঘুরির বর্ণনা নয়, তাই না?

শাকুর মজিদ : হ্যাঁ। তা তো অবশ্যই। অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আছে, ভ্রমণ মানেই কোনো সুন্দর বা জনপ্রিয় জায়গায় যাওয়া। কোথাও গিয়ে ছবি তোলা। আবার সেগুলোকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা। কিন্তু সাহিত্যিক অর্থে ভ্রমণ অনেক বিস্তৃত বিষয়। যেকোনো জায়গার সংস্কৃতি, মানুষের জীবনযাপনের ধরন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি—এসবকিছুই এখানে যুক্ত থাকে। ভ্রমণে আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরাই ভ্রমণসাহিত্যের কাজ। কারণ মানুষও নতুন জায়গার কথা জানতে চায়। হয়তো অনেকের পক্ষে সে অভিজ্ঞতা জানাও সম্ভব হয় না। ভ্রমণসাহিত্যের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হয়। এমনভাবে তুলে ধরতে হয় যাতে পাঠকও তা অনুভব করে।

আপনার লেখায় আমরা দেখি মানুষের গল্পটাকে গুরুত্ব দেন। এটা অনেকাংশে নতুন একটা ধরন। এ বিষয়টা কেমন?

শাকুর মজিদ : কোনো একটা জায়গাকে বুঝতে হলে সেখানকার মানুষকে জানতে হবে। পাহাড়, সমুদ্র কিংবা কোনো শহর—সবগুলোই নিজ নিজ আঙ্গিকে সুন্দর। কিন্তু সেখানে মানবিক স্পর্শ না থাকলে আর মানুষের গল্প না থাকলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নদীর বর্ণনা যখন দেবেন, তখন আসলে বেশি কিছু কী বলার আছে? নদী তো নদীই। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নদী, তার সঙ্গে জুড়ে থাকা নাম—এগুলোর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে। তাই কোথাও গেলে আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। মানুষের কাছে শুনতে শুনতে ভ্রমণকাহিনির কাঠামোটা তৈরি হয়ে যায়। এজন্য আমার একেকটা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পাঠককে একেক ধরনের অনুভূতি দেয়। ভ্রমণের সময় আমি সেই দেশের সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি। যেমন চিলিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে কবি পাবলো নেরুদার কথা। আবার গ্রিসে গেলে মনে পড়ে দার্শনিক সক্রেটিসের ইতিহাস। এই ধরনের সাংস্কৃতিক স্মৃতি একটি জায়গাকে বুঝতে সাহায্য করে। তাই ভ্রমণকাহিনিতে এগুলো স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। মজার ব্যাপার হলো, আমার ভ্রমণ শুরু হয় কলকাতা দিয়ে। কিন্তু আমি কলকাতা ভ্রমণ নিয়েই কিছু লিখিনি। পরে অবশ্য *১০ সদর স্ট্রিট : রবীন্দ্রনাথের কলকাতা* নামে একটি ভ্রমণগ্রন্থ লিখি। এ বইটি লেখার সময় আমি শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই অনেক তথ্য পেয়েছি এমন না। কীভাবে আসলে কলকাতা 'সিটি অব জয়', 'সিটি অব গ্লাস' থেকে রবীন্দ্রনাথের শহর হলো সে জ্ঞানও পেলাম। এভাবে প্রতিটা বইয়েই আমি মানুষকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। এটাকে নিছক নিঃসঙ্গতার বয়ান রাখতে চাইনি।

আপনি ভ্রমণকাহিনিতে ইতিহাসের অনুষঙ্গ অনেক ব্যবহার করেন। এটি কি সচেতনভাবেই করা হয়?

শাকুর মজিদ : হ্যাঁ। কোনো জায়গাকে বুঝতে হলে তার ইতিহাস জানা জরুরি। আমরা যদি কোনো শহরে যাই কিন্তু সেই শহরের অতীত সম্পর্কে কিছু না জানি, তাহলে সেই জায়গাটিকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হয় না। তাই আমি চেষ্টা করি ভ্রমণের আগে সেই জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করতে। অনেক সময় সেই তথ্যই লেখাকে সমৃদ্ধ করে। যেমন *ফেরাউনের গ্রাম* নামে আমার একটা বই আছে। এ বইটি লিখতে আমার অনেক সময় লেগেছে। মিশরতত্ত্ব, কোরান ও বাইবেলের তথ্য যাচাই করা আর ৫ হাজার বছরের মিশরীয় ফারাও রাজাদের কাহিনি আত্মস্থ করতে অনেক সময় লাগে।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

সাড়ে ৩ দিনের প·ত্রি·কা

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ৫ । মঙ্গলবার । ১০ মার্চ ২০২৬ । ২৫ ফাল্গুন ১৪৩২

ভ্রমণ তোমাকে বিনয়ী করবে
জানবে পৃথিবীর তুলনায় তুমি কত সামান্য

—গুস্তাভ ফ্লবেয়ার
ফরাসি লেখক

বি শে ষ র চ না

হাতিয়ার ভ্যান-চালক ও বিপন্ন পাখিরা

ইনাম আল হক

ভ্যানে চড়ে জাহাজমারা থেকে মুক্তারিয়া যাচ্ছি। হাতিয়া দ্বীপের দক্ষিণ-প্রান্তে পাখি-দেখার দীর্ঘ একটি দিন শেষ হচ্ছে। ভাঙাচোরা পথ। শরীরের সব শক্তি দিয়ে প্যাডেল মারছেন ভ্যান-চালক। কাঠের পাটাতন আঁকড়ে ধরে আমরা ভূপাতিত হওয়ার ভয় সামলে নিচ্ছি। আমি বললাম, 'ভ্যানঅলা ভাই, আর তো বসে থাকতে পারি না।'

বিরক্ত, পরিশ্রান্ত চালক স্থানীয় ভাষায় যা বললেন তার সারমর্ম হলো, রাস্তা ভাঙা থাকলে ভ্যান-চালকের কী করার আছে! আমি বললাম, 'আপনি আস্তে চালাতে তো পারেন।'

রাস্তা ও রাস্তার মালিককে ভ্যান-চালক মেলা গালমন্দ করলেন। ভ্যানের গতি কমল না। আমাদের শিরদাঁড়া কখন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সে দুশ্চিন্তায় কাটল বাকি পথ।

এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

সা ক্ষা ৎ কা র

ভ্রমণ মানে পৃথিবীকে নতুন করে দেখা

—শাকুর মজিদ

শাকুর মজিদ। একাধারে লেখক, স্থপতি ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা। সমসাময়িক সময়ে তিনি ভ্রমণসাহিত্য ধারাকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করে সে অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে শুধু দৃশ্যের বর্ণনা নয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি, মানুষ ও সাহিত্য দর্শনের নানা প্রসঙ্গও উঠে আসে। ভ্রমণসাহিত্য ও নিজের অভিজ্ঞতার মিশেলে *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার* পক্ষ থেকে এ গুণী লেখকের মুখোমুখি হয়েছিলেন **সোহাইল সোহান**

আপনাকে আমরা অজানা পথের ভ্রমণকার বলেই চিনি। ভ্রমণকে তো আপনি দৃশ্যের বর্ণনা নয়, বরং সময়ের প্রতীক বলেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এর জন্য তো একটা শুরু দরকার। সেটা কীভাবে হলো?

শাকুর মজিদ : শুরুটা ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে। তরুণ বয়সে নতুন নতুন জায়গা দেখার প্রতি আগ্রহ ছিল। কৌতূহলও ছিল। সে তাগিদে তো দেশে নানা জায়গায় ঘোরা হতো। তাছাড়া আমার শিক্ষাজীবনটাও এমন যে, আসলে সবসময় ছুটতে হয়েছে। ক্যাডেট কলেজে থাকা অবস্থায় ঘুরেছি। আবার লালন, হাসন রাজাসহ লোকসংস্কৃতির অনেক অনুষঙ্গ খুঁজতে গিয়েও ঘুরতে হয়েছে। সেগুলো ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় এসেছে বহুবার। তবে আমার ইচ্ছে ছিল বিদেশেও ঘুরবার। ১৯৯০ সালে সে সুযোগও এসে গেল। দেশের বাইরে প্রথম

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

ভ্র ম ণ গ দ্য

উজবেকিস্তানের অন্তরমহল

পিয়াস মজিদ

উজবেকিস্তানের নাম এলেই বাঙালিদের মনে পড়ে 'উজবুক' শব্দটির কথা। আরে, উজবুকের দেশ আবার যাওয়ার জায়গা হলো নাকি! এমন অর্থহীন জাত ও দেশবৈরী মনোভঙ্গিকে প্রত্যাখান করে ২০১৮ সালের অক্টোবরে উজবেকিস্তান রওনা হলাম আমরা। ঢাকা থেকে তখন তাসখন্দে সরাসরি কোনো ফ্লাইট নেই বিধায় ঢাকা টু কলকাতা, কলকাতা টু দিল্লি, দিল্লি টু তাসখন্দ—ইতিহাসের পরম্পরাময় (কাবাব, পোলাও থেকে শুরু করে যে নান্দনিক স্থাপত্য—বহু কিছুতে যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা তো ইতিহাসেরই অনিবার্য পরম্পরায়) চারটি শহর পেরিয়ে এলাম আমরা। আমরা বলতে—আমি, আখতার, রেবা, স্বনন, বাদল ও ফারুকী।

উজবেকিস্তানের দুটো শহরের নাম প্রথম পড়েছি হাফিজের কাব্যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে সেই বিখ্যাত

এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

কলাম

সাধ ও সাধ্যের ভ্রমণসাহিত্য

সানজিদা হাসনাত সূচনা

দুর্গাপূজার ছুটি থেকে ফেরার পর হুট করে ক্লাসে একদিন ঘোষণা আসলো। স্কুলের বার্ষিক পত্রিকায় ছাপাবার জন্য সবাইকে লেখা জমা দিতে হবে। এরই ভেতর আমার প্রিয় বন্ধু একদিন লেখা নিয়ে এসে জমা দিয়ে দিলো ম্যাডামের কাছে। কী নিয়ে লিখেছে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম, ও লিখেছে ওর পূজার ছুটি নিয়ে। মামা, ছোটবোন আর মাকে সঙ্গে নিয়ে পূজার ছুটিতে ও ঘুরতে গিয়েছিল কুয়াকাটা। সেখানে ওর দেখা হয়েছিল কমলা রঙের সূর্যাস্তের সাথে। সমুদ্র সৈকতে দেখা মিলেছিল ঘোড়ার সাথে, ঘোড়ার পিঠে উঠে থাকা মানুষ, সন্ধ্যার সময় বালিতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের। বন্ধু যেহেতু লেখা জমা দিয়েছে, আমাকেও লেখা দিতে হবেই। আমি হাবিজাবি কিছু একটা লিখে জমা দেই, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে কুয়াকাটার ওই বর্ণনায়। এর মাঝে আমি কত জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু মন পড়ে থাকত কুয়াকাটায়। যেন সেই সমুদ্র না দেখা হলে সব দেখাই বাকি থেকে যাবে।

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : মাহমুদুল হাসান | **সম্পাদক :** আজহার ফরহাদ
সম্পাদনা পর্ষদ : তৌহিদ ইমাম, আমিরুল আবেদিন আকাশ, রাশেদ সাদী, আরিফুল হাসান
অলংকরণ : লুৎফি রুনা, রাজীব রাজু, রাজীব দত্ত | **গ্রাফিক ডিজাইন :** সাইফুল সাগর, ফয়সাল মাহমুদ, মাহমুদ মিজু

বেঙ্গলবুকস-কিন্ডারবুকস নিবেদিত একটি বইমেলা প্রকাশনা। প্রকাশক কর্তৃক নোভা টাওয়ার ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট ওয়ার্কস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮২, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩ ● ইমেইল : info@kinderbooks.com.bd, info@bengalbooks.com.bd ● ওয়েব : www.kinderbooks.com.bd, www.bengalbooks.com.bd